চলো আল্লাহর জন্য বাঁচি

মূল
শাইখ মাহমুদ আল-হাসানাত

অনুবাদ
মাহদি হাসান

সাবিল
পাবলিকেশন

লেখকের উৎসর্গ

আপনার চেহারার বলিরেখা
আমার কাছে বর্ণনা করে একটি শানবাঁধানো রাস্তার গল্প,
যেটি আপনি আমার জন্য নির্মাণ করেছেন।
কতবার আমি আপনার ওপর ভর করেছি,
যেন-বা আপনি পৃথিবীর সুদৃঢ়তম স্তম্ভ।
হে আমার পিতা, আমার চোখে সর্বপ্রথম এবং সর্বশেষ মহানায়ক,
আপনাকে উৎসর্গ করছি এই গ্রন্থের প্রতিটি হরফ।

সূচিপত্র

অনুবাদকের কথা ৯
ভূমিকার বদলে ১১
মুসআব ইবনু উমাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর ইমানদীপ্ত গল্প ১৭
যারা আল্লাহকে ভয় করে তাদের জন্য আছে দুটি জান্নাত ২৩
মেঘমালাকে চূর্ণ করা মনোবল ৫২
শেষযাত্রার আগে ৭১
গুনাহ করার আগে ভাবুন ৯৫
নিজের হিসাব নিন ৯৮
কুরআনকে অবহেলা করবেন না ১০১
শেষ যদি হয় এমন, শুরুটা হবে কেমন ১০৮
আল্লাহ তাআলার আতিথেয়তা ১১১
আল্লাহ ও বান্দার মধ্যকার দরজা ১১৫
তিনি আমাদের অতি নিকটে ১১৬
কষ্টের পর আসে সুখ ১২৩
নিশ্চয়ই সে প্রত্যাবর্তনশীল ১২৭
গুহার অভ্যন্তরে ১৩০
মানুষ কেন এমন? ১৩৩
আল্লাহ আমাদের কাছে দুআ চান ১৩৫
যে অস্ত্র কখনও ব্যর্থ হয় না ১৩৭
ধৈর্যই উত্তম সমাধান ১৩৯
বিপদ আমায় শিখিয়েছে-১ ..... ১৪৫
বিপদ আমায় শিখিয়েছে-২ ..... ১৫০

বিপদ আমায় শিখিয়েছে-৩ ..... ১৫১
বিপদ আমায় শিখিয়েছে-৪ ..... ১৫২
বিপদ আমায় শিখিয়েছে-৫ ..... ১৫৪
বিপদ আমায় শিখিয়েছে-৬ ..... ১৫৬
বিপদ আমায় শিখিয়েছে-৭ ..... ১৫৮
বিপদ আমায় শিখিয়েছে-৮ ..... ১৬০
বিপদ আমায় শিখিয়েছে-৯ ..... ১৬১
শিক্ষক আমায় শিখিয়েছেন ১৬৩
রয়ে যাবে আল্লাহর সান্নিধ্য ১৬৭
অপূর্ব বন্ধুত্ব ১৭১
সোনালি অতীতের গল্প ১৭৪
আল্লাহর দিকেই ধাবিত হব, মানুষের দিকে নয় ১৭৭
জীবনের পাঠশালা ১৮০

অনুবাদকের কথা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য। আমরা তার কাছেই প্রার্থনা করি। তার কাছেই সাহায্য নিবেদন করি। অগণিত দুরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের প্রিয়নবি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তাঁর পরিবার-পরিজন, সাহাবায়ে কিরাম এবং তাঁর অনুসারীগণের উপর।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'নিশ্চয়ই কিছু কিছু কথায় রয়েছে জাদু।' [সহিহুল বুখারি: ৫৭৬৭।]

কথার মাধুর্যে মানুষ প্রভাবিত হয় সবচেয়ে বেশী। যুগে যুগে মানুষকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে আল্লাহ তাআলা প্রেরিত নবি-রাসুল এবং অলি-আউলিয়াগণ কথার মাধ্যমে মানুষকে নসিহত করেছেন। সালাফে সালেহিনও তাদের প্রজ্ঞাপূর্ণ নসিহতের মাধ্যমে মানুষকে ইসলামের দাওয়াত দিয়েছেন। পাপ কাজ থেকে নিষেধ করেছেন। তাদের কথার আশ্চর্য ও জাদুকরী প্রভাবে পাপের ফাঁদে পা দিয়ে দিকভ্রান্ত হওয়া অনেক মানুষ সঠিক পথে ফিরে এসেছেন। পেয়েছেন হিদায়াতের দিশা। আমাদের দেশের ওয়াজ-মাহফিলগুলোও এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। আমন্ত্রিত অতিথি আলিমগণের কথায় প্রভাবিত হয়ে অনেক মানুষই পাপ কাজ ছেড়ে নেকির পথে ফিরে আসেন।

শাইখ মাহমুদ আল-হাসানাত হাফিজাহুল্লাহু বর্তমান সময়ের এমনই একজন দাঈ, আলোচক ও লেখক, যার কথা মানুষের হৃদয় আন্দোলিত করে। তার দরদভরা কণ্ঠের আকুলতাময় ভাষায় শ্রোতার হৃদয়ে ভাবাবেগের ঝড় উঠে। বয়ান ও নসিহতের জাদুতে তিনি মুগ্ধ করে চলছেন ইয়ামান, ইরাক থেকে শুরু করে সুদূর মরক্কো পর্যন্ত বিস্তৃত আরবি ভাষাভাষী মানুষদেরকে। আমাদের বাংলাদেশেও তার অনেক গুণমুগ্ধ ভক্ত রয়েছেন। ১৯৮৪ সালে গাজা থেকে তিন কিলোমিটার উত্তরপূর্বে অবস্থিত মুখাইয়াম জাবালিয়া বা জাবালিয়া ক্যাম্পে তার জন্ম। গাজায় তার শৈশব ও বেড়ে উঠা হলেও বর্তমানে তিনি অবস্থান করেছেন তুর্কিতে। জন্মভূমি ফিলিস্তিন নিয়ে তার দরদপূর্ণ ও জ্বালাময়ী বক্তব্যে বিমোহিত আরব বিশ্বের সবাই। এর সুবাদে ২০০৬ সালে ফিলিস্তিন বিষয়ক আন্তর্জাতিক বক্তৃতা প্রতিযোগিতায় তিনি প্রথম স্থান অধিকার করেন। ২০১৮ সালের ২৭শে এপ্রিল তিনি আরব ও ইসলামি বিশ্বের শ্রেষ্ঠ আলোচক হিসেবে

'খতিবুল ফুকারা' পুরস্কারে ভূষিত হন। সাম্প্রতিক সময়ে তেজোদীপ্ত বক্তৃতার জন্য তাকে জেলজীবনও বরণ করতে হয়েছে।

মাধুর্যপূর্ণ আলোচনার পাশাপাশি তিনি বেশকিছু বইও লিখেছেন। সেগুলো তার হৃদয়ছোঁয়া আলোচনার চেয়েও মুগ্ধকর। 'চলো আল্লাহর জন্য বাঁচি' তার এমনই একটি বই। এটি তার রচিত 'لله نمضي' গ্রন্থের অনুবাদ। এই গ্রন্থে তার কিছু চমৎকার, হৃদয়ছোঁয়া ও মনোমুগ্ধকর আলোচনা সন্নিবেশিত হয়েছে। পাঠকের জন্য তাতে রয়েছে আত্মোন্নয়নের খোরাক। বিশেষ করে বর্তমান সময়ের হতাশাগ্রস্ত তরুণ ও যুবকদের জন্য বইটি আলোকবর্তিকা হিসেবে কাজ করবে। গুনাহের চোরাবালিতে দিশেহারা হয়ে যারা প্রতিনিয়ত নিজেকে খুঁজে ফিরছে, এই বইটি তাদের জন্য হতে পারে আলোর দিশা। শাইখ মাহমুদ আল-হাসানাত তার জ্ঞান, প্রজ্ঞা, অভিজ্ঞতা, পর্যবেক্ষণ ও ভাষিক মাধুর্যের অপূর্ব সমন্বয় ঘটিয়েছেন এই বইয়ের প্রতিটি পাতায়। আল্লাহ তাআলা তাকে নেক হায়াত দান করুন।

অনুবাদেও শাইখ মাহমুদ আল-হাসানাতের ভাষার সেই দরদ, আকুলতা ও মাধুর্য ধরে রাখার চেষ্টা করেছি। পাঠক যেন বইয়ের কথাগুলো হৃদয়ঙ্গম করে বাস্তব জীবনে এর প্রতিফলন ঘটাতে পারেন, সেই চেষ্টায় কোনো কার্পণ্য করিনি। বাকি বিচারটুকু পাঠকের হাতেই ছেড়ে দিলাম। তবুও মানুষ হিসেবে ভুল-ত্রুটি হয়ে যাওয়া স্বাভাবিক। এমন কিছু দৃষ্টিগোচর হলে আমাদের জানানোর অনুরোধ। বাংলা ভাষায় বইটির অনুবাদ প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছেন সাবিল পাবলিকেশনের কর্ণধার শ্রদ্ধেয় ইসমাইল ভাই। তিনি বইটি সুদূর মিসর থেকে আনিয়েছেন। আমার প্রতি আস্থা রাখায় তার প্রতি জানাচ্ছি হৃদয়জ কৃতজ্ঞতা।

পরিশেষে আল্লাহ তাআলার কাছে দুআ করছি, তিনি যেন বইটিকে লেখক, অনুবাদক, প্রকাশক, পাঠক ও সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য উপকারী করেন। পরকালে মুক্তির ওসিলা হিসেবে কবুল করেন। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন।

মাহদি হাসান
আবদুল্লাহপুর, কেরানীগঞ্জ, ঢাকা।

ভূমিকার বদলে

> ‘নিশ্চয়ই আমি মৃতদের জীবিত করি, আর লিখে রাখি যা তারা অগ্রে প্রেরণ করে আর যা পিছনে রেখে যায়।’[১]

আপনি নিশ্চয়ই জানেন, সবকিছুই লিপিবদ্ধ করে রাখা হয়। আল্লাহ তাআলা সবকিছুই সংরক্ষণ করেন। ভুলে যান না কিছুই। তাই আপনি কী রেখে যাচ্ছেন, তা নিয়ে অবশ্যই সতর্ক হওয়া উচিত।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

> سَبْعٌ يَجْرِي لِلْعَبْدِ أَجْرُهُنَّ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ وهُو فِي قَبْرِهِ: مَنْ عَلَّمَ عِلْمًا أَوْ كَرَى نَهْرًا أَوْ حَفَرَ بِئْرًا أَوْ غَرَسَ نَخْلا أَوْ بَنَى مَسْجِدًا أَوْ وَرَّثَ مُصْحَفًا أَوْ تَرَكَ وَلَدًا يَسْتَغْفِرُ لَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ.
>
> ‘বান্দার মৃত্যুর পর যখন সে কবরে থাকবে, তখনও সাতটি আমলের প্রতিদান অব্যাহত থাকবে। যথা: কাউকে দীনি ইলম শিক্ষা দেওয়া, নদী খনন করা, কূপ খনন করা, বৃক্ষ রোপণ করা, মসজিদ নির্মাণ করা, কুরআন বিতরণ করা এবং এমন সন্তান রেখে যাওয়া, যে তার মৃত্যুর পর তার জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করবে।’[২]

তাহলে চিন্তা করুন, আপনার আমলনামায় এমন কী আছে, যা আপনার মৃত্যুর পর স্মারক হয়ে থাকতে পারে? পরবর্তী প্রজন্মের জন্য আপনি কী রেখে যাচ্ছেন?

পার্থিব এই জীবনে আপনি কোন নেক আমল অগ্রে পাঠিয়েছেন?

কতজন অজ্ঞকে শিখিয়েছেন ইলম? কজন বিভ্রান্তকে দেখিয়েছেন সঠিক পথের দিশা?

কতজন পথভ্রষ্টকে সুপথ দেখাতে চেষ্টা করেছেন? কজন দরিদ্রকে করেছেন সাহায্য?

---

[১] সুরা ইয়াসিন, আয়াত: ১২।

[২] মুসনাদু বাজ্জার, হাদিস: ৭২৮৯।

কতজন প্রয়োজনগ্রস্তকে দান করেছেন? কজন ভিখারিকে দেননি ধমক?

অন্যদের মনে কতগুলো ভালো কথা রোপণ করতে পেরেছেন?

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কতগুলো হাদিস অন্যদের কাছে পৌঁছিয়েছেন?

বিবাদকারীদের মাঝে কতবার মীমাংসা করেছেন?

কতগুলো কল্যাণকর কাজে আপনি অংশগ্রহণ করেছেন? ভাবার মতো এমন আরও অসংখ্য প্রশ্ন আছে।

আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

وَٱجۡعَل لِّي لِسَانَ صِدۡقٖ فِي ٱلۡأٓخِرِينَ.

'এবং পরবর্তীদের মাঝেও আমার সুনাম-সুখ্যাতি অব্যাহত রাখুন।'
[সুরা আশ-শুআরা: ৮৪]

এই আয়াতের ব্যাখ্যা হচ্ছে, আমাকে তাওফিক দিন এমন কিছু সুন্দর আমলের, যেগুলোর কল্যাণে মৃত্যুর পর আমার কথা শ্রদ্ধা ও ভক্তির সঙ্গে স্মরণ করা হবে। কল্যাণকর কাজে আমার অনুসরণ করা হবে।

তাই আপনি যদি এমন কোনো মহৎ কর্মের স্বাক্ষর রেখে যেতে চান, তবে আপনাকে হতে হবে স্বচ্ছ নিয়ত, নিষ্কলুষ হৃদয় আর মহৎ লক্ষ্যের অধিকারী। থাকতে হবে সুদৃঢ় সংকল্প, ত্যাগ স্বীকারের সদিচ্ছা এবং নিরলস কল্যাণকর কাজ করে যাওয়ার সৎসাহস।

আপনার জন্য নির্বাচন করুন এমন একটি সীমান্ত, যা হবে আপনার সক্ষমতা ও দক্ষতার উপযোগী। যেখানে দাঁড়িয়ে আপনি নিজেকে করতে পারবেন উম্মাহর জন্য নিবেদিত। প্রতিহত করতে পারবেন উম্মাহর প্রতি ধেয়ে আসা শত্রুর প্রতিটি তির। আর মানুষের সর্বপ্রথম শত্রু হচ্ছে অভিশপ্ত শয়তান। একটি কথা সবসময় মনে রাখবেন, শয়তান বলতে আমরা সাধারণত যাকে বুঝে থাকি, শুধু সে-ই একমাত্র শয়তান নয়। এমন অনেক মানবরূপী শয়তান আছে, যারা অধিক বিপজ্জনক। হায় আফসোস! এই সময়ে এসে মুসলিম উম্মাহর মাঝে সৃষ্টি হয়েছে অনেক ফাটল। তৈরি হয়েছে অনেক সীমান্ত। কিন্তু সেগুলোতে প্রহরীর সংখ্যা খুবই কম। তবুও আমরা কত উদাসীন! যা দেখে

আশ্চর্য না হয়ে পারা যায় না। প্রত্যহ সকালে আমরা বের হই নিজেদের বিক্রি করতে। তারপর কেউ নিজেকে মুক্ত করতে পারি, আবার কেউ হয়ে যাই বন্দি। তাই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যখন প্রশ্ন করা হয়েছিল, আল্লাহ তাআলার কাছে সবচেয়ে প্রিয় মানুষ কে? তিনি বলেছিলেন,

أَحَبُّ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ وَأَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ سُرُورٍ تُدْخِلُهُ عَلَى مُسْلِمٍ أَوْ تَكْشِفُ عَنْهُ كُرْبَةً أَوْ تَقْضِي عَنْهُ دِينًا أَوْ تُطْرَدُ عَنْهُ جُوعًا وَلِأَنْ أَمْشِيَ مَعَ أَخٍ لِي فِي حَاجَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَكِفَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ يَعْنِي مَسْجِدَ الْمَدِينَةِ شَهْرًا وَمَنْ كَفَّ غَضَبَهُ سَتَرَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ وَمَنْ كَظَمَ غَيْظَهُ وَلَوْ شَاءَ أَنْ يُمْضِيَهُ أَمْضَاهُ مَلَأَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَلْبَهُ أَمْنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ مَشَى مَعَ أَخِيهِ فِي حَاجَةٍ حَتَّى أَثْبَتَهَا لَهُ أَثْبَتَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَدَمَهُ عَلَى الصِّرَاطِ يَوْمَ تَزِلُّ فِيهِ الْأَقْدَامُ.

‘আল্লাহ তাআলার কাছে সবচেয়ে প্রিয় মানুষ হচ্ছে, যে অন্যদের জন্য সবচেয়ে বেশি উপকারী হয়। আর আল্লাহ তাআলার কাছে সবচেয়ে প্রিয় আমল হচ্ছে কোনো মুসলিমের জন্য আনন্দ ও স্বস্তির উপলক্ষ্য তৈরি করা, তার বিপদ দূর করে দেওয়া, তার ঋণ শোধ করে দেওয়া, অথবা তার ক্ষুধা দূরীভূত করা। কোনো ভাইয়ের প্রয়োজনে তার পাশে দাঁড়ানো আমার কাছে এই মসজিদে (মসজিদে নববিতে) এক মাস ইতিকাফ করার চেয়েও অধিক পছন্দনীয়। যে ব্যক্তি তার ক্রোধ নিয়ন্ত্রণ করে, আল্লাহ তাআলা তার দোষ-ত্রুটি গোপন রাখবেন। আর যে ব্যক্তি রাগ দেখানোর ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তা দমিয়ে রাখে, আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন তার হৃদয়কে আশায় পূর্ণ করে দেবেন। যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের প্রয়োজনে পাশে দাঁড়িয়ে তা পূর্ণ করে দেওয়ার ব্যবস্থা করে,

আল্লাহ তাআলা তাকে সেই কঠিন দিনে অটল রাখবেন, যে-দিন সবাই থাকবে ভয়ে তটস্থ।'[৩]

তিনি আরও বলেছেন,

إِنَّ سُوءَ الْخُلُقِ يُفْسِدُ الْعَمَلَ كَمَا يُفْسِدُ الْخَلُّ الْعَسَلَ.

'দুশ্চরিত্র মানুষের আমলকে এমনভাবে বিনষ্ট করে দেয়, যেভাবে সিরকা বিনষ্ট করে দেয় মধুর স্বাদ।'[৪]

তাই নিজেকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করুন, যারা সবাইকে ঐক্যবদ্ধ করে। আর দূরত্ব বজায় রাখুন তাদের কাছ থেকে, যারা মানুষের মাঝে বিচ্ছিন্নতার বীজ বুনে দেয়।

আপনি হয়তো ভাবেন, আপনার যদি অনেক সম্পদ থাকত, তাহলে খুবই ভালো হতো। লোকদের মাঝে দান-সদকা করে আপনি তাদের মনে উত্তম প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারতেন। এই ভাবনা কিছুতেই সঠিক নয়। বরং আপনার কাছে যখন কোনো চিন্তাগ্রস্ত ব্যক্তি আসবে, মনোযোগ দিয়ে তার কথা শ্রবণ করুন। কেউ এসে ওজর দেখালে তাকে সুযোগ দিন। কেউ তার প্রয়োজনে ডাকলে তার উপকার করুন। এমনকি আপনি যখন পথ থেকে সামান্য একটি কাঁটা সরাবেন, তখন যদি আপনার মনে অন্যের প্রতি সহানুভূতির বিশুদ্ধ নিয়ত থাকে, সেটিই আপনার মুক্তির জন্য যথেষ্ট হতে পারে।

শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতিতেও আপনি দান করতে শিখুন। শিখুন, ভেতর থেকে ক্লান্ত হলেও কীভাবে আপনার চারপাশের মানুষকে আলোর দিশা দেখাবেন। তারপর দেখবেন, এই দানের সওয়াব আপনাকে এমন এক সফলতা দিয়েছে, যা আপনার কল্পনাতেও ছিল না। এভাবেই আপনি রেখে যেতে সক্ষম হবেন আপনার জন্য মহোপকারী প্রভাব ও মহৎ কর্মের স্বাক্ষর। আল্লাহ তাআলা বলেন,

يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ. إِلَّا مَنْ أَتَى ٱللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ.

[৩] আল-মুজামুল আওসাত, হাদিস: ৬০২৬।

[৪] মুসনাদু আবদ ইবনি হুমাইদ, হাদিস: ৭৯৯।

> ‘সেদিন সম্পদ আর সন্তান-সন্ততি কোনো কাজে আসবে না। তবে যে ব্যক্তি নিরাপদ হৃদয় নিয়ে আল্লাহ তাআলার কাছে উপস্থিত হবে, সে ব্যতীত।’ [সুরা আশ-শুআরা, আয়াত: ৮৮–৮৯]

অতএব, যিনি কোনো মহৎ কর্মের স্বাক্ষর রেখে যেতে পারেননি, তিনি যেন মৃত জীবনযাপন করেছেন। দুঃখীর দিকে তাকিয়ে আপনার দেওয়া মুচকি হাসিটিও একটি মহৎ কর্ম। অবস্থান ও সফরের সময় সালামের আমল করাও একটি মহৎ কর্ম। অপরের আহ্বানে সাড়া দেওয়াও একটি মহৎ কর্ম। অন্যের ব্যথায় ব্যথিত হওয়া আর অন্যের সফলতায় আনন্দ অনুভব করাও মহৎ কর্ম। অসহায় বন্ধুর প্রতি আপনার সামান্য সহানুভূতিও লেখা হবে মহৎ কর্মের খাতায়। আপনার মুখ থেকে নিঃসৃত হওয়া চমৎকার বাক্যমালা আর মিষ্টি ব্যবহারও হবে মহৎ কর্ম হিসেবে গণ্য। কুরআনের প্রতি আপনার যত্ন, পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার এবং সকল দান-সদকা লিপিবদ্ধ হবে মহৎ কর্মের তালিকায়। এই তালিকা ক্রমশই দীর্ঘ হতে থাকবে।

মহৎ কর্মের মাধ্যমে অন্যের জীবনে রেখাপাত করার জন্য আপনাকে সুউচ্চ কোনো পাহাড়ের চূড়ায় উঠতে হবে না। কোনো আশ্চর্য ক্ষমতার অধিকারীও হতে হবে না। বরং আপনার প্রাত্যহিক জীবনযাত্রা আর চরিত্রের মাঝেই রয়েছে এমন অনেক কিছু, আপনি অগ্রগামী হয়ে যেগুলো বিলিয়ে দিতে পারেন মানুষের মাঝে। আপনার চলন-বলন আর কথাবার্তায় প্রশস্ততা অবলম্বনের মাধ্যমেই পারবেন কারও হৃদয়ে গভীর রেখাপাত করতে। তাই পৃথিবী থেকে প্রস্থান নেওয়ার আগে রেখে যান এমন কিছু মহৎ কর্মের স্বাক্ষর, যা মৃত্যুর পরেও আপনাকে অমর করে রাখবে।

তাই, আপনার নেক আমলের বীজতলাকে সদা সিঞ্চিত রাখুন, যেন সেখান থেকে বের হওয়া ডালপালা আচ্ছাদিত করে নিতে পারে প্রতিটি পথিককে। হয়তো তারা আপনার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে বলে উঠবে, তিনি তো চলে গেছেন। কিন্তু তার এই মহৎ কর্ম আজও অক্ষত রয়ে গেছে।

তাই চলার পথে হোন সংযত। গুরুত্ব দিয়ে শ্রবণ করুন দুঃখীদের কথা। দৃষ্টিকে করুন উদার। নিজের ব্যক্তিত্বকে করুন এমন মহান, যেন আপনার মৃত্যুর পরও লোকেরা বলে ওঠে, তিনি তো চলে গেছেন। কিন্তু তার এই মহৎ কর্ম আজও অক্ষত রয়ে গেছে।

বিপুলা এই পৃথিবীতে আমরা কেবল দুদিনের মেহমান,
আর প্রত্যেক মেহমানের জন্যই বিদায় অনিবার্য।

জিবরাইল আলাইহিস সালাম একদিন প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বলেন,

> يَا مُحَمَّدُ عِشْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَيِّتٌ وَأَحْبِبْ مَنْ أَحْبَبْتَ فَإِنَّكَ مُفَارِقُهُ وَاعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَجْزِيٌّ بِهِ.
>
> ‘হে মুহাম্মাদ, যত ইচ্ছে জীবনযাপন করে নিন, নিশ্চয়ই আপনাকে মৃত্যুর স্বাদ নিতে হবে। প্রিয়জনদের যত পারেন ভালোবেসে নিন, নিশ্চয়ই তার সঙ্গে আপনার বিচ্ছেদ হবে। আর যত পারেন আমল করে নিন, নিশ্চয়ই আপনাকে এর পূর্ণ প্রতিদান দেওয়া হবে।’[৫]

আমরা ফিরে যাব আল্লাহ তাআলার দিকেই।

বিনীত

মাহমুদ আল-হাসানাত

১৯/০৯/২০২২ খ্রিস্টাব্দ

***

[৫] আল-মুস্তাদরাক লিল হাকিম, হাদিস: ৭৯২১।

যারা আল্লাহকে ভয় করে তাদের জন্য আছে দুটি জান্নাত

মনের অন্দরে আল্লাহ তাআলার ভয় আর চোখের তারায় তাঁর শঙ্কা নিবদ্ধ করার মধ্য দিয়ে আপনার পার্থিব ও পরকালীন জীবন হয়ে উঠবে নিশ্চিন্ত ও প্রশান্তিময়। ভয় আপনাকে করবে নিরাপদ; শঙ্কা আপনাকে করবে নিশ্চিন্ত। প্রভুর ভয় আপনাকে পথ দেখাবে দুটি জান্নাতের পথে। যেখানে শুধু অনাবিল আনন্দ, সুখ আর শান্তির হাতছানি।

সালাফের জীবনে আল্লাহর ভয় লালনের এমন অসংখ্য দৃষ্টান্ত আছে, যা হৃদয়কে নাড়িয়ে দেয় প্রবলভাবে। অদৃশ্যের জ্ঞানী সত্তার প্রতি হৃদয়ে প্রোথিত শঙ্কা তাদেরকে ধাবিত করেছে রজনির দীর্ঘ সালাত আর তাহাজ্জুদে চোখের পানি ঝরিয়ে আল্লাহ তাআলার নৈকট্য লাভের দিকে। উৎসাহিত করেছে সত্যবচন আর সিয়াম পালনের মধ্য দিয়ে আপন প্রভুর কাছে এগিয়ে যেতে। আল্লাহর প্রতি তাদের এই ভয় ছিল চিরসুখের জান্নাতে নিরাপদ আবাসন গড়ে তোলার অব্যর্থ অবলম্বন।

ইবনুল কাইয়িম আল-জাওজিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'ভয় হচ্ছে হৃদয়স্থিত একটি প্রদীপ, যার আলোয় চেনা যায় সব কল্যাণ আর অকল্যাণ। পৃথিবীতে যাদেরকে আমরা ভয় পেয়ে থাকি, তাদের কাছ থেকে পালিয়ে বেড়াই। কিন্তু আল্লাহকে ভয় পেলে আমরা তাঁর দিকেই ছুটে যাই।'

তাই আল্লাহর ভয় আপনাকে প্রলুব্ধ করবে তাঁর দুয়ারেই ছুটে যেতে। আহ্বান করবে তাঁর চৌকাঠে মস্তক অবনত করতে। হৃদয়ের ভালো-মন্দ পার্থক্য করার মাপকাঠি এই ভয়। অতি উত্তম ইবাদত এবং অতি উৎকৃষ্ট পাথেয়। যা আপনার অন্তঃকরণকে করে তুলবে আল্লাহ তাআলার শ্রেষ্ঠ বান্দাদের কাতারে উন্নীত হওয়ার যোগ্য।

এমনইভাবে আল্লাহ তাআলার ভয় মানুষকে সতর্ক করে পাপ এবং প্রবৃত্তির সাগরে নিমজ্জিত হওয়া থেকে। হৃদয়ে সৃষ্টি করে এমন এক আন্দোলন, যা আপনাকে টেনে নেবে কল্যাণের দিকে। আর আত্মার মাঝে তৈরি হবে এমন সৌন্দর্য, যা আপনাকে পৌঁছে দেবে সফলতার দ্বারপ্রান্তে। ইবরাহিম ইবনু সুফিয়ান রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'অন্তরে যখন আল্লাহর ভয় আবাস গড়ে নেয়,

প্রবৃত্তির ক্ষেত্রগুলোকে ভস্মীভূত করে দেয় আর পার্থিব লালসাকে করে বিতাড়িত।'

তাই আপনি যদি হৃদয়ে আল্লাহর ভয় অনুভব করেন, এর মানে মহামহিম সত্তার দয়া ও নিরাপত্তা আপনি লুফে নিয়েছেন। আপনার অস্তিত্বে যখন সর্বক্ষণের জন্য আল্লাহর ভয় গেঁথে যাবে, এর মানে আপনি আয়ত্ত করে নিয়েছেন চিরস্থায়ী সফলতার পথ। লাভ করেছেন এমন নির্মল হৃদয়, যার মাঝে পার্থিব পেরেশানি আর দুঃখ-হতাশার অনুপ্রবেশ নিষিদ্ধ। যে হৃদয়ে হরদম চাষ হয় অনাবিল সুখের নীড় জান্নাতের আগ্রহ।

যুন্নুন আল-মিসরি রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, 'মানুষ ততক্ষণই সঠিক পথে থাকে, যতক্ষণ তাদের মাঝে আল্লাহর ভয় থাকে। আল্লাহর ভয় দূর হয়ে গেলেই তারা পথভ্রষ্ট হয়ে যায়।'

যে হৃদয়ে আল্লাহর ভয় নেই, তাতে বসতি গড়ে বিনাশ আর অনিষ্টের সেনাদল। গ্রাস করে প্রবৃত্তি আর ফিতনার প্রলয়। পৃথিবীটা তার জন্য হয়ে যায় বিপদের গহ্বর। একফোঁটা শান্তি বা স্বস্তি জোটে না তার ভাগ্যে। জাগে না কোনো মুগ্ধতা। দূর হয়ে যায় মায়া-মমতা। ব্যথা আর দুর্দশার মাঝে ডুবে ঘোরগ্রস্ত এক জীবন কাটে তার।

তাই জেনে রাখুন, আত্মার নিরাপত্তার উৎস হচ্ছে আল্লাহ তাআলার ভয় ও শঙ্কা। এর মাধ্যমে অন্তর হয় কলুষতামুক্ত ও পূত-পবিত্র। চিন্তাক্লিষ্ট চেহারাকে করে প্রশান্ত। পথ দেখায় আশাবাদ ও নির্মলতার প্রতি। হৃদয়ের করিডোর থেকে বিদূরিত করে সব ক্লান্তি ও বিরক্তি।

ফুজাইল ইবনু ইয়াজ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'আল্লাহকে যে ভয় করে, সেই ভয় তাকে সকল কল্যাণকর কাজের পথ দেখিয়ে দেয়।'

আল্লাহর ভয়হীন হৃদয় তাই অনিষ্টের আঁতুড়ঘর। নশ্বর এই পৃথিবীতে আল্লাহর ভয় লালনের অনিবার্য বিনিময় জান্নাতের চিরসুখের নীড়। যেখানে হাতের নাগালেই পেয়ে যাবেন হৃদয়ের যত নির্মল চাহিদা। ভয়ের স্পর্শে আপনার মন হবে প্রশস্ত ও প্রসন্ন। আর ললাট হবে হাস্যোজ্জ্বল ও আলোকময়। তাই আল্লাহর ভয়ই হচ্ছে চিরস্থায়ী নিরাপত্তার চাবিকাঠি; মর্মন্তুদ শাস্তি থেকে পরিত্রাণ দানকারী একমাত্র সরল সঠিক পথ।

ইয়াহইয়া ইবনু মুআজ রাহিমাহুল্লাহকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, কোন ব্যক্তির ভবিষ্যৎ সবচেয়ে নিরাপদ? তিনি বলেন, 'বর্তমানের প্রতি যার ভয় সবচেয়ে বেশি।'

আমরা বর্তমানের তাড়নায় ভবিষ্যতের জন্য কষ্ট-ক্লেশ করি। অথচ বর্তমানের হবে প্রস্থান আর ভবিষ্যতের হবে আগমন। তাই আল্লাহর ভয় এবং শঙ্কাই হোক আপনার ভবিষ্যতের একান্ত পাথেয়। যেন আপনার আত্মা হয় ইমানের বারিধারায় সিক্ত আর অন্তর হয় দৃঢ় সংকল্পের ছোঁয়ায় সজীব।

হাসান বসরি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'যারা আপনাকে ভয় দেখাতে দেখাতে এমন অবস্থায় নিয়ে যায় যে, আপনি নিরাপত্তার আশা করতে থাকেন, তাদের সংস্পর্শ আপনার জন্য উত্তম ওই ব্যক্তিদের সংস্পর্শের চেয়ে, যারা আপনাকে নিশ্চয়তা দিতে দিতে এমন অবস্থায় উপনীত করে যে, আপনি ভয়ের আশঙ্কা করতে থাকেন।'

আল্লাহর ভয় হৃদয় থেকে পৃথিবীর সকল ক্ষমতাধর শক্তি ও সুপার পাওয়ারের ভয় দূর করে দেয়। তখন আপনার ব্যস্ততার একমাত্র লক্ষ্য হয় আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন। যেদিন তাঁর সঙ্গে আপনার সাক্ষাৎ হবে, সেই দিনের প্রস্তুতিকে ঘিরে নিমগ্ন থাকে আপনার প্রতিটি প্রহর। ইবনুল জাওজি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'যে আল্লাহকে ভয় করে, তাকে পৃথিবীর সবকিছু ভয় করে।'

তাই হৃদয়কে ভয়ের নিবাস বানিয়ে প্রত্যাবর্তন করুন আল্লাহ তাআলার দিকে। অশ্রুসিক্ত নয়নে নিমগ্ন হোন রজনির মুনাজাতে। নিশ্চয়ই আপনার প্রভু তাঁর সুপ্রশস্ত ক্ষমার হাত বাড়িয়ে নিয়ে নেবেন আপনার সকল ভার।

ধরার বুকে ইসলামি অনুশাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রথম তিন শতাব্দীতে ইসলামি সাম্রাজ্যে মাত্র ছয়টি চুরির ঘটনা ঘটেছিল। অর্থাৎ, প্রতি একশত বছরে দুইটি করে। বিস্ময়কর এই জরিপের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আমরা একটু পিছনে তাকাই। ফিরে যাই পৃথিবীর ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ সময়ে। প্রিয়নবি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পায়ের কদমে যখন ধন্য হচ্ছিল এ ধরার মাটি। সাহাবি মায়িজ ইবনু মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু করে ফেলেন ব্যভিচারের মতো ভয়াল গুনাহে লিপ্ত হওয়ার অপরাধ। নবিজিকে স্বচক্ষে দেখেও, তাকে নিয়ে কুরআনের আয়াত অবতীর্ণ হবে, যা তিলাওয়াত করা হবে কিয়ামত পর্যন্ত—এ কথা জেনেও তিনি নিজেকে নিবৃত্ত করতে পারেননি ব্যভিচারের মায়াজাল থেকে। বরং অপরাধ করার পর তিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের

কাছে গিয়ে দেন সরল স্বীকারোক্তি। নিজ হাতেই তিনি উন্মোচন করেন তার তদন্তের খাতা; যদিও আল্লাহ তাআলা তা ঢেকে রেখেছিলেন গোপনীয়তার চাদরে।

ইবনুল কাইয়িম রাহিমাহুল্লাহ বলেন,

তিনি চিরঞ্জীব তাই বান্দাকে করেন না লাঞ্ছনার শিকার
যখন সে অবলীলায় জমাতে থাকে গুনাহের পাহাড়,
তিনি আরও ঢেকে দেন সব গোপনীয়তার চাদরে,
সবকিছুই তিনি করেন গোপন, জড়িয়ে নেন পরম ক্ষমার ডোরে।

মায়িজ ধীর পায়ে হেঁটে হেঁটে নবিজিকে গিয়ে বলেন, হে আল্লাহর রাসুল, আমাকে পবিত্র করুন। নবিজি বলেন, আফসোস তোমার জন্য! ফিরে যাও, আল্লাহর কাছে ক্ষমা চেয়ে তওবা করে নাও।

অল্প একটু যাওয়ার পর মায়িজ পুনরায় নবিজির কাছে ফিরে এসে বলেন, হে আল্লাহর রাসুল, আমাকে পবিত্র করুন।

নবিজি তাকে ফিরিয়ে দেওয়ার পরও তিনি আবার ফিরে এলেন দেখে অবাক হবেন না, কেন তিনি ফিরে এলেন? কী রহস্য এর পিছনে? আল্লাহ তাআলা তো তার অপরাধ ঢেকেই রেখেছেন। নবিজি তাকে এবারও বলে দিলেন, ফিরে গিয়ে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চেয়ে তওবা করে নাও।

একটু পথ যাওয়ার পর তৃতীয়বারের মতো মায়িজ নবিজির কাছে ফিরে এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসুল, আমাকে পবিত্র করুন।

নবিজি আবারও বললেন, আফসোস তোমার জন্য! ফিরে যাও। আল্লাহর কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করে তওবা করে নাও।

এমন করেই নবিজি বারবার তাকে আল্লাহর কাছে ফিরে যাওয়ার সুযোগ করে দিচ্ছিলেন। তাকে শিখিয়ে দিচ্ছিলেন, আল্লাহ তাআলার চেয়ে অধিক দয়া, মায়া-মমতা আর উদারতা পৃথিবীর কারও নেই।

কিন্তু মায়িজ চতুর্থবারের মতো ফিরে আসেন। নবিজিকে বলেন, হে আল্লাহর রাসুল, আমাকে পবিত্র করুন।

এবার প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, কোন অপরাধ থেকে তোমাকে পবিত্র করব মায়িজ?

মায়িজ বলেন, ব্যভিচার থেকে।

নবিজি মায়িজের সাথি-সঙ্গীদের জিজ্ঞেস করেন, সে কি পাগল? তারা বলেন, জি আল্লাহর রাসুল, না তো; সে পাগল নয়।

খেয়াল করুন, মায়িজ স্পষ্ট স্বীকারোক্তি দেওয়া সত্ত্বেও নবিজি তার সঙ্গীদেরকে তার মানসিক ভারসাম্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছেন। যদি তিনি রক্তপাত ভালোবাসতেন, যেমনটি কিছু লোক মনে করে থাকে, তবে তিনি তৎক্ষণাৎ মায়িজকে শাস্তির মুখে দাঁড় করাতেন। কিন্তু নবিজি তাকে চারবার ফিরিয়ে দিয়েছেন। আমাদের শিখিয়েছেন এমন একটি সবক, যা একটু পরই জানতে পারবেন।

নবিজি মায়িজের সঙ্গীদেরকে আরও জিজ্ঞেস করেন, 'সে কি মদ পান করে চিন্তাশক্তি হারিয়ে ফেলেছে?'

তখন এক সাহাবি উঠে দাঁড়ান। মায়িজের মুখের গন্ধ শুঁকে বলেন, হে আল্লাহর রাসুল, না, সে মদ পান করেনি।

এবার নবিজি ফায়সালা দেন। মায়িজকে পাথর নিক্ষেপে হত্যা করা হয়। এরপর প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

لَقَدْ تَابَ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ أُمَّةٍ لَوَسِعَتْهُمْ.

> 'সে এমন অনুপম তওবা করেছে, তা যদি পুরো উম্মতের মাঝে বণ্টন করে দেওয়া হয়, তাদের জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে।'[৮]

মায়িজ রাদিয়াল্লাহু আনহু কেন নিজ থেকেই অপরাধ স্বীকার করে শাস্তি মাথা পেতে নিলেন? আর কেনই-বা নবিজি তাকে সরাসরি শাস্তি না দিয়ে বারংবার তওবা করার জন্য ফিরিয়ে দিলেন? আমরা আজও এই রহস্য উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা করে যাই।

[৮] সহিহ মুসলিম, হাদিস: ১৬৯৫।

অনেকেই হয়তো বলবেন, মায়িজ ছিলেন একজন সাহসী লোক। তাই ভীরুর মতো পিছিয়ে না থেকে তিনি অপরাধ স্বীকার করে নিয়েছেন। তাহলে গামেদি গোত্রের সেই নারীর ব্যাপারে কী বলবেন? তিনিও নবিজির সময়ে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ে পড়েন। তারপর নবিজির কাছে এসে বলেন, হে আল্লাহর রাসুল, আমাকে পবিত্র করুন।

নবিজি তাকেও বলেন, আফসোস তোমার জন্য! ফিরে যাও। আল্লাহর কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করে তওবা করে নাও।

সেই নারী বলেন, আপনি যেভাবে মায়িজ ইবনু মালিককে ফিরিয়ে দিয়েছেন, আমাকেও কি সেভাবে ফিরিয়ে দিতে চাইছেন?

ভাবুন, যিনি নবিজিকে এমন করে কথাটি বললেন, তিনি কিন্তু একজন নারী।

তারপর তিনি নবিজিকে বলেন, আমি ব্যভিচারের ফলে গর্ভবতী হয়েছি।

নবিজি তাকেও পাথর নিক্ষেপে মৃত্যুর রায় দিয়েছিলেন? না।

তিনি সেই নারীকে বলেন, যাও। আগে তোমার গর্ভের সন্তান প্রসব হোক।

সেই নারী ফিরে যান। সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর পুনরায় নবিজির কাছে এসে বলেন, আমাকে পবিত্র করুন।

নবিজি কি এবারে এসে তাকে পাথর নিক্ষেপ করতে বলেছেন? না। এবারেও বলেননি; বরং তাকে বলেন, চলে যাও। তাকে দুধ পান করাও, যতক্ষণ না সে দুধ ছেড়ে দেয় সেই পর্যন্ত।

তারপর আবার যখন ফিরে আসেন, সেই নারীর সন্তানের হাতে দেখা গেল রুটির টুকরা।

কেন তিনি ফিরে এলেন? কেনই-বা নিজের ওপর প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুর শাস্তি প্রয়োগের ব্যাপারে তার এমন আশ্চর্য পীড়াপীড়ি? কেন তিনি সন্তানের লালন-পালনের জন্য নিজেকে নিবৃত্ত করলেন না? দুই বছর অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়ার পর তিনি না এলেও তো পারতেন! তবুও কেন ফিরে এলেন?

নবিজির কাছে এসে আবারও তার অকপট উচ্চারণ। বললেন, হে আল্লাহর রাসুল, এই তো আমার সন্তান। দেখতেই পাচ্ছেন তাকে দুধ পান করিয়ে বড় করেছি। এবার আমাকে পবিত্র করুন।

নবিজি এবার তাকে প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুর ফায়সালা দিলেন। তা বাস্তবায়ন করা হলো। পাথর নিক্ষেপকারীদের একজন ছিলেন খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু। ক্ষোভে রক্তবর্ণ হয়ে তিনি সেই নারীকে গালি দিলে নবিজি তাকে বলেন,

مَهْلًا يَا خَالِدُ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ لَغُفِرَ لَهُ.

> ‘থামো হে খালিদ। আল্লাহর শপথ, সে এমন তওবা করেছে, অন্যায়ভাবে লোকদের সম্পদ হরণকারী ব্যক্তিও যদি এমন তওবা করে, তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হবে।’[৯]

কয়েক বছর আগে আমি মদিনার এক মসজিদে বক্তব্য দিতে গিয়েছিলাম। পথে একটি কূপের ফলক আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে নেয়। তাতে লেখা ছিল, ‘এই কূপটি সেই গামেদি নারীর রুহের ক্ষমা কামনায় উৎসর্গিত।’ চৌদ্দশত বছর আগে নবিজি তাকে প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুর রায় দিয়েছেন। আজও তার রুহের মাগফিরাত কামনার জন্য খনন করা হচ্ছে কূপ!

এখান থেকে আমরা অনুধাবন করতে পারব সেই রহস্যটি, যা মায়িজ ইবনু মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং সেই গামেদি নারীকে (রাদিয়াল্লাহু আনহা) ধাবিত করেছে নবিজির কাছে গিয়ে অপরাধ স্বীকার করে শাস্তি মেনে নিতে। এ-ও বুঝতে পারব যে, কেন নবিজি তাদেরকে বারবার ফিরিয়ে দিয়েছেন। আরও আবিষ্কার করতে পারব, কেন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সময়ে শাস্তি ও হদের সংখ্যা ছিল আঙুল দিয়ে গোনার মতো নগণ্য। সেই সমাজে শাস্তি প্রদানের কোনো উপকরণও ছিল না তখন।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সাহাবিদেরকে গড়ে তুলেছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ মাপকাঠি অনুযায়ী। যে মাপকাঠি কোনো সমাজে বাস্তবায়ন করা হলে সেই সমাজকে কখনও বিচার-আদালতের দ্বারস্থ হতে হবে না। খুন, ব্যভিচার, চুরি, ডাকাতি এসব কোনো অপরাধের সম্মুখীন হতে হবে না তাদের। অপরাধীদের জন্য সেই সমাজ হবে কারাগার। আর সৎ লোকদের জন্য তা হবে শান্তি-সুখের নীড়।

---

[৯] সহিহ মুসলিম, হাদিস: ১৬৯৫।

এই মাপকাঠিই মায়িজ ইবনু মালিক ও গামেদি নারীকে শাস্তি কামনার প্রতি ধাবিত করেছে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রিয় সাহাবিগণ এই মাপকাঠি মেনেই জীবনভর চলেছেন। দিনরাত নিজেদেরকে মগ্ন রেখেছেন প্রভুর কাছে রোনাজারিতে।

এই মাপকাঠির নাম আল্লাহ তাআলার ভয়

আল্লাহ তাআলা কুরআনে যেখানে পুরুষদের প্রশংসা করেছেন, সেখানে তাদের বিশ্বাসের সাক্ষ্য এবং তাদের সম্পদের কারণে প্রশংসা করেননি। তিনি বলেন,

رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ۙ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ.

> ‘তারা এমন পুরুষ, যাদেরকে ব্যাবসা-বাণিজ্য ও ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহর স্মরণ, সালাত আদায় এবং জাকাত প্রদান করা থেকে বিরত রাখে না। তারা ভয় করে সেই দিনকে, যেদিন অন্তর ও দৃষ্টি উলটে যাবে।’ [সুরা আন-নুর: ৩৭]

আয়াতের শুরুতে আল্লাহ তাদেরকে বলেছেন পুরুষ। অতঃপর আয়াতের মাঝামাঝি এসে বলেছেন তারা ভয় করে। সুতরাং বুঝা গেল, আল্লাহ তাআলার ভয়ই তাদেরকে প্রকৃত পুরুষে পরিণত করেছে—যাদের প্রতিটি ক্ষণ হয় আল্লাহ তাআলার জন্য নিবেদিত, জীবনের ব্যস্ততা যাদেরকে আল্লাহ তাআলার স্মরণ থেকে বিচ্যুত করতে পারে না।

আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু একদিন বসে ছিলেন। শুনতে পান তার এক সঙ্গী বলছেন, ‘আমি (আখিরাতে) ডান দিকের লোকদের কাতারে থাকতে চাই না, আমি চাই নৈকট্যশীলদের অন্তর্ভুক্ত হতে। কারণ, ডান দিকের লোকদের চেয়ে নৈকট্যশীলদের মর্যাদা বেশি।’ তখন আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, ‘অথচ এখানে এমন লোকও আছে, যার কামনা, মৃত্যুর পর যেন তার পুনরুত্থান না হয়। আমি চাই, মৃত্যুর পর যেন আমার পুনরুত্থান না হয়। আমার তো আশা হয়, আমি যদি হতাম অপর গাছের শরীর বেয়ে উঠা কোনো পরগাছা লতা, বেয়ে বেয়ে যে গাছের চূড়ায় উঠে যায়,

অতঃপর তার মৃত্যু হয়, যেমন করে মরে যায় অন্য সব গাছ। তবুও যেন কিয়ামতের দিন আমাকে আল্লাহ তাআলার সম্মুখে দাঁড় করানো না হয়।'

يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ.

'তারা ভয় করে সেই দিনকে, যেদিন অন্তর ও দৃষ্টি উলটে যাবে।' [সুরা নুর: ৩৭]

কঠিন সেই দিনের চিন্তা সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম ও সালাফে সালেহিনের ঘুম কেড়ে নিয়েছিল।

যেমনটি আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا.

'তাদের পার্শ্ব শয্যা থেকে আলাদা থাকে। তারা তাদের পালনকর্তাকে ডাকে ভয়ে ও আশায়।' [সুরা আস-সাজদাহ: ১৬]

কীসের ভয়? কঠিন সেই দিনের ভয় তাদেরকে নিদ্রার বিছানায় চোখের পাতা এক করতে দিত না।

কোনো এক সালাফ বলেছেন, হাসান বসরি এবং উমর ইবনু আবদুল আজিজ রাহিমাহুমাল্লাহর মতো আল্লাহর ভয় লালনকারী আমি অন্য কাউকে দেখিনি। তাদের অবস্থা এমন ছিল যে, যেন-বা জাহান্নাম শুধু তাদের দুজনের জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে।

আরেক বুজুর্গ ব্যক্তি মৃত্যুর পর প্রচণ্ড কান্না করছিলেন। তা দেখে তার মা-ও কান্না করতে থাকেন। তিনি মাকে জিজ্ঞেস করেন, আপনি কেন কান্না করছেন? মা বলেন, তোমার কান্না দেখে কাঁদছি হে আমার সন্তান। বুজুর্গ ব্যক্তি বলেন, আমি তো কাঁদছি কিয়ামতের কঠিন দিনে আল্লাহ তাআলার সম্মুখে উপস্থিত হওয়ার ভয়ে।

এই ভয় রাজাধিরাজ প্রভুর ভয়। তার মুখোমুখি দাঁড়ানোর ভয়। অপর এক সালাফ বলেন, 'সকল কল্যাণের উৎস হচ্ছে আল্লাহ তাআলার ভয়।' এই ভয় ইমানের অনিবার্যতম অনুষঙ্গ। যার হৃদয়ে একরতিও আল্লাহর ভয় নেই, সে মুমিন নয়। আল্লাহ তাআলা বলেন,

فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ.

‘তাদের ভয় কোরো না। আমাকে ভয় করো, যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাকো।’ [সুরা আলি ইমরান: ১৭৫]

ইবনুল কাইয়িম আল-জাওজিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, ‘ভয় হচ্ছে ইমানের বিশুদ্ধতার নিদর্শন। হৃদয় থেকে ভয়ের প্রস্থান মানে ইমানেরই প্রস্থান।’

উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু পৃথিবীতে জান্নাতের সুসংবাদ পাওয়া সত্ত্বেও মৃত্যুর সময় তার পুত্র আবদুল্লাহ ইবনু উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলেছিলেন, ‘তোমার পিতার গালকে মাটির ওপর রাখো, যেন আল্লাহ তাআলা তোমার পিতার প্রতি দয়া করেন। হায়! উমরের মা যদি উমরকে প্রসবই না করত!’

জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও কী ভীষণ ভয় তার! কী কান্না! অথচ আমাদের মুখভরা হাসি দেখে মনে হয়, আমরা যেন আকাশ ও জমিনের প্রশস্ততার সমান জান্নাতের মালিকানা পেয়ে গেছি!

আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

মৃত্যুর পর যদি না হতো হিসাব
তবে তা হতো পরম স্বস্তির ক্ষণ,
কিন্তু মৃত্যুর পর হবে পুনরুত্থান
প্রশ্নের মুখোমুখি হব কিয়ামতের দিন।

ব্যবসায়ী যদি তার প্রভুকে ভয় করত, কখনও নিত না প্রতারণার আশ্রয়।

শাসক যদি তার প্রভুকে ভয় করত, প্রজাদের ওপরে চালাত না নিপীড়ন।

চোর যদি তার প্রভুকে ভয় করত, অন্যের সম্পদ ছিনিয়ে নেওয়ার সাহস করত না কখনও।

ব্যভিচারী যদি তার প্রভুকে ভয় করত, কখনও দেখাত না হারামে লিপ্ত হওয়ার দুঃসাহস।

আল্লাহর ভয় অপরাধ ও গুনাহের প্রতিবন্ধক; বরং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সময়ে এটিই ছিল অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার সমান।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ.

> ‘আর যারা আল্লাহকে ভয় করে, তাদের জন্য আছে দুটি জান্নাত।’ [সুরা আর-রহমান: ৪৬]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

مَنْ خَافَ أَدْلَجَ وَمَنْ أَدْلَجَ بَلَغَ المَنْزِلَ أَلَا إِنَّ سِلْعَةَ اللَّهِ غَالِيَةٌ أَلَا إِنَّ سِلْعَةَ اللَّهِ الجَنَّةُ.

> ‘যে ভয় পায়, যে ভোরেই যাত্রা শুরু করে। আর যে ভোরে যাত্রা করে, সে নির্বিঘ্নে গন্তব্যে পৌঁছতে পারে। জেনে রাখো, আল্লাহ তাআলার পণ্য খুবই দামি। সেই পণ্যের নাম জান্নাত।’[১০]

সবচেয়ে বেশি হাদিস বর্ণনাকারী আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহুও তার মৃত্যুর সময় খুব কান্না করছিলেন। লোকেরা জিজ্ঞেস করে, আপনি কি দুনিয়ার জন্য কাঁদছেন? তিনি বলেন, ‘আল্লাহর শপথ, তোমাদের এই দুনিয়ার কিছুর জন্যই আমি কাঁদছি না।’

হ্যাঁ, আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু অস্থায়ী এই দুনিয়ার জন্য কাঁদছিলেন না। কারণ, প্রকৃত মুমিন কখনও দুনিয়ার জন্য ব্যথিত হয় না। নেককাজ, ইবাদত ও ভালো আমলের সুযোগ শেষ হয়ে গেছে ভেবে তার হৃদয় স্ফুরিত হয়ে কান্নার ঢল নামে।

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু কেন কাঁদছিলেন?

তিনি বলেন,

أَمَا إِنِّي لا أَبْكِي عَلَى دُنْيَاكُمْ هَذِهِ وَلَكِنِّي أَبْكِي لِبُعْدِ سَفَرِي وَقِلَّةِ زَادِي. أَصْبَحْتُ فِي صُعُودٍ مُهْبِطَةٌ عَلَى جُنَّةٍ وَنَارٍ فَلا أَدْرِي إِلَى أيهما يسلك بي.

[১০] সুনানুত তিরমিজি, হাদিস: ২৪৫০।

> ‘আমি তোমাদের দুনিয়ার জন্য কাঁদছি না। আমি কাঁদছি এই ভেবে যে, আমার পাথেয় খুবই অল্প। কিন্তু যাত্রা করছি দীর্ঘ এক সফরে। আমার বিশ্বাস দুর্বল। কী হবে আমার শেষ পরিণতি, পুলসিরাতের ওপর থেকে যদি পড়ে যাই জাহান্নামের অগ্নিগর্ভে! এই ভয়ে আমি তটস্থ।’[১১]

অথচ আমরা এখন কীসের জন্য কাঁদি, কীসের ভয় করি? একটু কি ভেবে দেখেছেন?

আমাদের সন্তানদের কি লোকে কী বলবে সেই ভয় দেখাই, না কি আল্লাহ তাআলা প্রকাশ্যে ও গোপনে সর্বাবস্থাতেই তাকে দেখছেন, সেই ভয় দেখিয়ে গড়ে তুলি?

আমাদের সন্তানদের আমরা বলি, কাউকে গালি দিয়ো না, কারও গিবত কোরো না। কারণ, দেয়ালেরও কান আছে। কেউ তোমার কথা শুনে ফেলতে পারে। খুব কম মানুষই হয়তো এই বলে সন্তানের পরিচর্যা করেন যে, আল্লাহ তাআলা সবকিছু দেখছেন। সবকিছু তিনি শুনছেন। এমন করে সন্তানকে পৃথিবীর সবকিছুর ঊর্ধ্বে আল্লাহ তাআলার ভয় লালন করার শিক্ষা এখন খুব কম মানুষই দিয়ে থাকেন।

আল্লাহ তাআলা হাদিসে কুদসিতে বলেছেন,

> وَعِزَّتِي لَا أَجْمَعُ عَلَى عَبْدِي خَوْفَيْنِ وَأَمْنَيْنِ إِذَا خَافَنِي فِي الدُّنْيَا أَمَّنْتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَإِذَا أَمِنَنِي فِي الدُّنْيَا أخفته يوم القيامة.
>
> ‘আমার সম্মানের শপথ, কোনো বান্দার মাঝে আমি একসঙ্গে দুইটি ভয় এবং দুইটি নিরাপত্তা একত্র করব না। সে যদি দুনিয়াতে আমাকে ভয় করে, কিয়ামতের দিন আমি তাকে নিরাপত্তা দেবো। আর সে যদি দুনিয়াতে নিজেকে আমার ভয় থেকে নিরাপদ মনে করে, তবে আমি কিয়ামতের দিন তাকে ভীতসন্ত্রস্ত করব।’[১২]

[১১] আত-তাবাকাতুল কুবরা, খণ্ড: ৪, পৃষ্ঠা: ২৫৩, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ। –অনুবাদক
[১২] সহিহু ইবনি হিব্বান, হাদিস: ৬৪০।

শীতল যে রাতগুলোতে আপনি আল্লাহকে ভয় করে বিছানার আরাম ছেড়ে তাহাজ্জুদ ও ফজর সালাতের জন্য উঠে গেছেন, সেই রাতগুলোর জন্য আপনাকে অভিনন্দন। এমন রাতগুলোতে যেমন করে ভয় লালন করেছেন সালাফে সালেহিন, আপনার ভয়ও ঠিক তেমনই। সালাফে সালেহিন রাত্রি জেগে ইবাদতের সময়ে বিছানার দিকে তাকিয়ে বলতেন, 'আল্লাহর শপথ, ওহে বিছানা, তোমার ওপরে শুয়ে নিদ্রাযাপন খুবই আরামদায়ক। কিন্তু আল্লাহর সান্নিধ্যের প্রতি আমার আগ্রহের প্রাবল্য, হৃদয় থেকে তোমার স্বাদকে বিদূরিত করে দিয়েছে।'

যে প্রহরগুলোতে আপনি রজনির গভীরতা আর ভোরের হিমেল বাতাসের সঙ্গ নিয়ে ইবাদতে মগ্ন থাকেন, সেই প্রহরগুলোর জন্য আপনাকে অভিনন্দন। আপনার মতোই ছিল শাদ্দাদ ইবনু আওস রাদিয়াল্লাহু আনহুর ভয়। বিছানায় শয়নের সময় তিনি কড়াইয়ের তেলে ভাজা কোনো শস্যের মতো গুটিয়ে যেতেন যেন। বলতেন, 'হে আল্লাহ, জাহান্নামের ভয় আমাকে নিদ্রায় বিভোর হতে দেয় না।'

আমের ইবনু আবদুল্লাহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, আমি দেখতে পেলাম জান্নাতই এমন একমাত্র বস্তু, যার কামনাকারীরা নিদ্রায় বিভোর হয়ে থাকে। আর জাহান্নাম এমন একমাত্র বস্তু, যা থেকে আশ্রয় প্রার্থনাকারীরা পলায়ন না করে ঘুমে ডুবে থাকে।

প্রভুর কাছে ক্ষমা চেয়ে অশ্রু ঝরে যাদের,
তাদের চোখের অশ্রু দেখে জায়নামাজও কাঁদে;
লেলিহান অগ্নিশিখার সম্মুখ হওয়ার ভয়ে,
মনের মাঝে ভয় ও আশা ত্রস্ত হয়ে কাঁপে।

সেই রাতগুলোর জন্য আপনাকে অভিনন্দন, যখন আপনার সম্মুখে হারামকে পরিবেশন করা হতো আকর্ষণীয় মোড়কে, কিন্তু আপনি নিজেকে বিরত রাখতেন। মনে করতেন আল্লাহ তাআলার এই কথা,

أَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ ٱللَّهَ يَرَىٰ.

'তুমি কি জানো না, আল্লাহ তাআলা সবকিছু দেখেন।' [সুরা আল-আলাক: ১৪]

সেই মুহূর্তের জন্য আপনাকে অভিনন্দন, যখন আপনার হাতে ঘুস রাখা হয়েছে, কিন্তু আল্লাহ দেখে ফেলবেন সেই ভয়ে আপনি তা প্রত্যাখ্যান করেছেন।

যখন কেউ আপনাকে কষ্ট দিলে তাকে এই ভেবে মাফ করে দিয়েছেন যে, আল্লাহ তাআলা দেখছেন।

যখন আল্লাহ দেখে ফেলার ভয়ে নিজের দৃষ্টিকে হারাম থেকে সংযত করেছেন।

আল্লাহ দেখছেন তাই অল্প হালাল সম্পদের প্রতিই সন্তুষ্ট থেকেছেন। সেইসব মুহূর্তের জন্য আপনাকে অভিনন্দন।

অনন্তের পথে যাত্রা হবে যেদিন, বলো না পেরিয়ে এসেছি সব
বরং বলো, আমার ওপর সদা নিবদ্ধ আছে একজনের চোখ,
ভেবো না কখনও আল্লাহ নেবেন না অতীতের হিসাব,
তা-ও হবে না অদৃশ্য যা রাখতে চেয়েছ গোপন।

সেই রাতের কথা কি আপনার মনে পড়ে, যে রাতে আপনি আল্লাহর ভয়ে চোখের পানি ঝরিয়ে কেঁদে কেঁদে তারপর গিয়েছিলেন ক্ষণিকের নিদ্রায়? আমি সুসংবাদ দিচ্ছি, আপনার সেই অশ্রুগুলো বৃথা যায়নি। কারণ, প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

لَا يَلِجُ النَّارَ رَجُلٌ بَكَى مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ.

> ‘আল্লাহর ভয়ে যে মানুষটি কাঁদে, সে কখনও জাহান্নামে প্রবেশ করবে না।’[১৩]

পৃথিবীর সব ভয়কে ভয় বলেই অভিহিত করা হয়। কিন্তু আল্লাহর জন্য যে ভয়, সেই ভয়ের নাম নিরাপত্তা। এর মাধ্যমেই অপরাধী আল্লাহর দিকে ফিরে এসে তওবা করে নেয়। অবাধ্য সন্তান পিতা-মাতার অনুগত হয়। আত্মীয়তা ছিন্নকারী নিবেদিত হয় আত্মীয়তা রক্ষায়। অন্যায়ভাবে ইয়াতিম ও অসহায়ের সম্পদ হরণকারী হয় তাদের প্রতি দয়ার্দ্র। কর্কশ ব্যক্তি হয় তার প্রতিবেশীর প্রতি সদয় এবং অত্যাচারী ফিরে আসে সরল সঠিক পথে।

[১৩] সুনানুন নাসায়ি, হাদিস: ৩১০৮।

ইবনুল জাওজি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'যে আল্লাহকে ভয় করে, তাকে সবকিছুই ভয় করে।' পৃথিবীতে যাদেরকে আপনি ভয় করেন, তাদের কাছ থেকে পালাতে পারলেই বাঁচেন। কিন্তু আল্লাহকে যখন ভয় করেন, আপনি তার দিকেই ছুটে যান। তাই মনে যদি ভয় থাকে, তাহলে আপনি প্রতিটি পদক্ষেপেই আল্লাহ তাআলার নৈকট্যের দিকে এগিয়ে যাবেন।

জীবন উত্তাল ঢেউয়ের এক সমুদ্র। এর বাঁকে বাঁকে আছে অনেক প্রতিকূলতা। একমাত্র আল্লাহর ভয়ই পারবে সেই উত্তাল সমুদ্রের বুক থেকে উদ্ধার করে এনে আপনাকে তীরে ভেড়াতে।

আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'মুমিনের দৃষ্টিতে তার গুনাহ বিশাল এক পাহাড়। সে ওই পাহাড়ের নিচে বসে আছে, আর যেকোনো সময় তার ওপর পতিত হওয়ার আশঙ্কা করছে। আর পাপাচারীর কাছে তার গুনাহ ক্ষুদ্র কোনো মাছির মতো। যা তার নাকের সামনে দিয়ে গেলেও সে কোনো ভ্রুক্ষেপ করে না।'

একপলকের জন্যও যে গুনাহে লিপ্ত হয়নি, সেই ব্যক্তিও আল্লাহ তাআলাকে ভয় করে। বিশ্বাস হচ্ছে না? তাহলে আমার সঙ্গে লক্ষ করুন ফেরেশতাগণের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা কী বলছেন,

يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ.

> তারা ভয় করে তাদের ওপর পরাক্রমশালী তাদের পালনকর্তাকে আর যা আদেশ করা হয় তা-ই পালন করে। [সুরা আল-আলাক: ১৪]

আমরা যখন আল্লাহর প্রতি ভয় লালন করে, শঙ্কিত হৃদয়ে একান্ত অনুগত হয়ে আল্লাহ তাআলার দিকে প্রত্যাবর্তন করব, তখনই আমাদের শোচনীয় অবস্থার পরিবর্তন হবে।

কিন্তু কীভাবে আল্লাহকে ভয় করব?

যারা আল্লাহকে ভয় করে, তাদের পথে কীভাবে চলব?

কীভাবে আল্লাহর প্রতি ভয় রেখে এবং তাঁর শাস্তি থেকে সতর্ক হয়ে আমরা তাঁর সঙ্গে জীবনযাপন করব?

আমাদের হৃদয়গুলো হয়ে গেছে নির্জীব। কুরআনের সতর্কতা আর ধমক প্রদানকারী আয়াতগুলোও তাতে কোনো নাড়া দেয় না। এর কারণ, ঘন মরিচার আবরণে ঢেকে আমাদের অন্তরগুলো নির্জীব হয়ে গেছে। যাদের প্রতি আল্লাহ দয়া করেছেন, তারাই পরিত্রাণ পেয়েছে এই দুর্দশা থেকে।

আমাদের সালাফে সালেহিন কীভাবে আল্লাহর শাস্তির ভয় ও তাঁর পাকড়াও থেকে সতর্ক হয়ে তাঁর সঙ্গে জীবনযাপন করেছেন, তা যদি লক্ষ করি, তাহলে আমরা মুখোমুখি হব অভাবনীয় ও অকল্পনীয় কিছু দৃশ্যের, যা আমাদের হতবিহ্বল করে দেবে।

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু একদিন হেঁটে যাচ্ছিলেন। পথের ধারে বৃক্ষের ডালে বসে থাকা একটি পাখির ওপর চোখ পড়ে তার। তখন মনের আক্ষেপের দুয়ার মেলে তিনি বলেন, 'ও পাখি, কত সুন্দর তোমার জীবন। ঘুরে বেড়াও এ গাছ থেকে ও গাছের ডালে। অবারিত ফল থেকে করো আহার। নেই কোনো হিসাবের ভয়, নেই কোনো শাস্তির ভয়। আমিও হতাম যদি তোমারই মতো। আল্লাহর শপথ, আমার তো আশা হয়, আমি যদি হতাম পথের ধারের ছোট্ট গাছ! আমার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় কোনো উট আমাকে প্রবেশ করাতো তার মুখের ভিতরে। তারপর চিবিয়ে চিবিয়ে খেয়ে মলের সঙ্গে ত্যাগ করত আমাকে। তবুও আমি যদি মানুষ না হতাম!'

তখন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'হায়, আমি যদি হতাম আমার পরিবারের কোনো দুম্বা। তাদের মনোমতো আমাকে মোটাতাজা করত। তারপর কোনো আপনজন বেড়াতে এলে তারা আমাকে জবাই করত। কিছু অংশ করত ভুনা। কিছু অংশ শুকাত রোদে। তারপর তৃপ্তিভরে ভক্ষণ করত। তবুও আমি যদি মানুষ না হতাম!'[১৪]

আবু বকর ও উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা—যারা ছিলেন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পর ধরার বুকে শ্রেষ্ঠ মানুষ। এমন ছিল তাদের ভয়! অথচ আমাদের মাঝে কি এর অল্পখানি ভয়ও আছে?!

আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু আরও বলেছেন, 'আমি যদি হতাম কোনো নিষ্ঠাবান মুমিন বান্দার বুকের পশম।'

[১৪] শুআবুল ইমান, হাদিস: ৭৬৮।

তার ব্যাপারে আরও বর্ণিত আছে, তিনি তার জিহ্বা ধরে বলতেন, 'এই বস্তুটিই আমাকে যত বিপদে নিপতিত করেছে।'

তিনি অনেক কান্না করতেন। বলতেন, তোমরা কান্না করো। যদি কান্না না আসে, তবে অন্তত কান্নার ভান করো। সালাতে দাঁড়ালে আল্লাহর ভয়ে ও তাঁর মহিমার সম্মুখে তিনি হয়ে যেতেন কাঠের মতো সোজা। মৃত্যুর সময় আদরের কন্যা উম্মুল মুমিনিন আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে তিনি বলেন, 'হে আমার মেয়ে, মুসলিমদের সম্পদ থেকে একটি আবায়া, একটি দুগ্ধদোহনের পাত্র এবং একটি গোলাম আমি ব্যবহার করেছি। তুমি দ্রুত সেগুলো উমর ইবনুল খাত্তাবের কাছে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা কোরো।'

তারপর বলেন, 'আল্লাহর শপথ, আমি যদি হতাম এই গাছের মতো, যাকে কামড়ে কামড়ে খেয়ে ফেলে দেওয়া হয়।'

কী আশ্চর্য তাই না! রেখে যাওয়া সামান্য এই সম্পদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হওয়ার শঙ্কায় তিনি কেমন তটস্থ হয়ে পড়েছিলেন। অথচ আজ দেখা যায়, মানুষ কত অবলীলায় সাধারণ লোকের হক থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করে। আল্লাহর ভয়ের ন্যূনতম কোনো চিহ্নও তাদের মাঝে দেখা যায় না। হারাম থেকে বাঁচার ব্যাপারে তাদের কোনো গুরুত্ব নেই। কোনো কিছুর পরোয়া না করেই তারা অন্যায়ভাবে মানুষের সম্পদ হরণ করে। তারা কি সেদিনের ভয় করে না, যেদিন অন্তর ও চক্ষুসমূহ উলটে যাবে?

উসমান ইবনু আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহুকে দেখুন। তিনি যখন কবরের পাশে দাঁড়াতেন, এত বেশি কাঁদতেন, তার দাড়ি ভিজে যেত। বলতেন, 'যদি আমাকে জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝে দাঁড় করানো হয়, আর আমি জানি না এর কোনটিতে আমাকে যেতে বলা হবে, তখন আমি ঠিক কোনটিতে যাব তা জানার আগেই মাটির সঙ্গে মিশে যেতে চাইব।'

আলি ইবনু আবি তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহুর কান্না আর ভয়ও ছিল না কম। দুইটি বিষয়কে তিনি খুব ভয় করতেন—দীর্ঘ আশা আর প্রবৃত্তির অনুসরণ। তিনি বলেন, 'দীর্ঘ আশা আখিরাতের কথা ভুলিয়ে দেয়। আর প্রবৃত্তির অনুসরণ দূরে সরিয়ে রাখে সঠিক পথ থেকে। দুনিয়া ক্রমশই পালিয়ে যাচ্ছে পিছনে আর এগিয়ে আসছে আখিরাত। উভয়েরই আছে অনুসারী। তাই আখিরাতের অনুসারীদের অন্তর্ভুক্ত হও। দূরে থাকো দুনিয়ার অনুসারীদের

জটলা থেকে। আজ তোমার আমলের সময়, হিসাব নেই। কিন্তু আগামীকাল তোমার হিসাবের দিন। তখন কোনো আমলের সুযোগ থাকবে না।'

হৃদয়গ্রাহী একটি কথা তিনি প্রায়ই বলতেন,

মৃত্যুর পর যদি না হতো হিসাব
তবে তা হতো পরম স্বস্তির ক্ষণ,
কিন্তু মৃত্যুর পর হবে পুনরুত্থান
প্রশ্নের মুখোমুখি হব কিয়ামতের দিন।

সারি আস সাকাতি রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, 'আমি দাসবাজারে গিয়ে দেখতে পেলাম এক দাসী নিজেকে ক্রটিমুক্ত হিসেবে ঘোষণা করছে। দশ দিনারের বিনিময়ে আমি তাকে ক্রয় করি। বাড়ি ফিরে আসার পর তার সম্মুখে খাবার দিলে সে বলে, আমি রোজা রেখেছি। আমি তখন বেরিয়ে আসি তার কাছ থেকে। রাত হয়ে গেলে আমি তার কাছে খাবার নিয়ে যাই। সে যৎসামান্য আহার করে। তারপর আমরা ইশার সালাত আদায় করি। সালাত শেষে সে আমার কাছে এসে বলে, হে আমার মনিব, আপনার আর কোনো খেদমত বাকি আছে কি? আমি বলি, না। সে বলে, তাহলে আমাকে এখন সবচেয়ে বড় মনিবের কাছে যেতে দিন। আমি বলি, অবশ্যই। অতঃপর সে তার কামরায় গিয়ে সালাত আদায়ে মগ্ন হয়। আর আমি ঘুমিয়ে পড়ি। রাতের এক-তৃতীয়াংশ পার হওয়ার পর সে আমার দরজায় কড়া নাড়ে। আমি জিজ্ঞেস করি, কী চাও? সে বলে, হে আমার মনিব, আপনি কি রাতের কোনো অংশে আমল করেন না? আমি বলি, না। তখন সে চলে যায়। মধ্যরাত হওয়ার পর সে আবার আমার দরজায় কড়া নেড়ে বলে, হে আমার মনিব, তাহাজ্জুদগুজার ব্যক্তিরা জেগে উঠে ইবাদতে মগ্ন হয়েছেন। নেককার ব্যক্তিরা নিরত হয়েছেন তাদের নিয়মিত আমলে। আমি তাকে বলি, 'ওহে দাসী, রাতের বেলায় আমি থাকি নির্জীব কাঠের মতো। আর দিনার বেলায় কর্মব্যস্ততায় আমার অবস্থা হয় চলন্ত গাড়ির মতো।'

শেষরাতে সে এসে আমার দরজায় প্রচণ্ড জোরে কড়া নেড়ে বলে, আপনার প্রভুর সঙ্গে নিভৃতে মুনাজাতে মগ্ন হওয়ার কোনো আগ্রহই কি আপনার মাঝে নেই? নিজেকে প্রস্তুত করে ইবাদতের স্থান নির্বাচন করে নিন। খাদিমরাও আপনার চেয়ে এগিয়ে গেছে।

সারি আস সাকাতি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, তার এই কথা আমাকে প্রবলভাবে নাড়া দেয়। ঘুম থেকে উঠে ভালোভাবে অজু করে কয়েক রাকাত সালাত পড়ি। তারপর অন্ধকারের মাঝে দাসীটিকে খুঁজতে থাকি। দেখতে পাই সে সিজদায় লুটিয়ে আছে আর বলছে, 'হে আমার প্রভু, আপনার প্রতি আমার ভালোবাসার বিনিময়ে আমাকে ক্ষমা করে দিন।' আমি তাকে বলি, হে দাসী, তুমি কী করে জানো আল্লাহ তোমাকে ভালোবাসেন? সে জবাব দেয়, তিনি ভালোবাসেন বলেই আমাকে রেখেছেন জাগ্রত আর আপনাকে রেখেছেন ঘুমন্ত। আমি তখন বলি, যাও। আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির লক্ষ্যে আমি তোমাকে মুক্ত করে দিলাম। সে কিছুক্ষণ দুআ করে বিদায় নেওয়ার বেলায় বলে, 'এই মুক্তি তো ছোট। বড় মুক্তি এখনও বাকি (অর্থাৎ জাহান্নাম থেকে মুক্তি)।

তাদের অন্তরে কেমন ভয় ছিল আল্লাহর!

আর দুনিয়ার মোহ আমাদের করে দিল এ কী করুণ হাল?!

কেমন করে আমাদের হৃদয়গুলো হয়ে গেল পাথরের চেয়েও শক্ত?

কেমন করে আমরা পিছিয়ে গেলাম সালাফের কাতার থেকে?

আমরা কি জাহান্নাম থেকে মুক্তির নিশ্চয়তা পেয়ে গেছি?

কুরআনের আয়াত পড়ে কতবার কেঁদেছি?

কুরআনের উপদেশমালা নিয়ে কতবার চিন্তাভাবনা করেছি?

কুরআনের ধমক ও সতর্কতায় ভয় পাওয়ার সময় এখনও কি হয়নি আমাদের?

আতা আস-সুলাইমি রাহিমাহুল্লাহকে দেখুন, অজু সম্পন্ন করার পর তিনি ভয়ে কেঁপে উঠতেন। ভেঙে পড়তেন প্রচণ্ড কান্নায়। এ ব্যাপারে তাকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, আমি এখন খুব বড় একটি কাজ করতে যাচ্ছি। দাঁড়াতে যাচ্ছি মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ তাআলার সম্মুখে।

আপনার মাঝে আল্লাহ তাআলার ভয়ের নিদর্শন হচ্ছে, দ্রুতবেগে তাঁর আনুগত্যের প্রতি ধাবিত হওয়া, গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা এবং আকাশ ও জমিনসম প্রশস্ত জান্নাতে স্থান করে নেওয়ার প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হওয়া। যে আল্লাহকে যথার্থভাবে ভয় করে, আল্লাহ তার বিপদ দূর করে দেন। মুক্ত করেন সংকীর্ণতার চক্র থেকে। প্রতিটি জটিলতায় তার জন্য প্রস্তুত করে দেন সমাধান।

হাতের মুঠোয়। যেদিন থেকে ভয় বিলুপ্ত হয়ে গেছে, অন্যরা এসে আমাদের অধীনস্থ করে নিয়েছে।

আর আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ .

‘নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা কোনো জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ না তারা নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন করে।’ [সুরা আর-রাদ: ১১]

হে সত্য সঠিক মুসলিম উম্মাহ, আঘাতে আঘাতে ক্ষত হয়েছে অনেক প্রশস্ত,
চোখে কি পড়ে না অকাতরে ঝরতে থাকা রক্তের ফোঁটাগুলো?
একনিষ্ঠ মনে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তনই একমাত্র ঔষধ,
পালটে দেবে বিধ্বস্ত রূপ, আঁকা হবে বিজয়ের প্রতিচ্ছবি।

***

মেঘমালাকে চূর্ণ করা মনোবল

যে হৃদয় সঙ্গ দিতে পারে না অসীম সাহসের
সে হৃদয় আমার নয়, আমিও নই সে হৃদয়ের।

সাহসিকতা একটি জাতিকে যাচাই করার মানদণ্ড। এর আলোকেই করা যায় প্রতিটি মানুষের প্রকৃত মূল্যায়ন। এমন অনেক ব্যক্তি আছে, যাদের দেহ শীর্ণকায় হলেও তাদের সাহস স্পর্শ করেছে মেঘমালা ও নক্ষত্রকে। আবার অনেক সুস্থ-সবল, সুঠাম দেহ আর শক্তি-সামর্থ্যের অধিকারী মানুষের সাহসিকতা থাকে পায়ের তলায়।

ইতিহাসের পাতায় উচ্চ সাহসিকতা ও দৃঢ় সংকল্পের অধিকারী অনেক মহানায়কের গল্প লিপিবদ্ধ হয়েছে। সেইসব গল্প লেখা হয়েছে আলোর হরফে। তাদের সাহসিকতা ছিল সেতুর ভূমিকা পালনকারী, যা অতিক্রম করে তারা পৌঁছেছিলেন আনন্দ আর উল্লাসের রাজত্বে।

উচ্চাশার কোনো সীমারেখা নেই। নেই তা বেঁধে রাখার মতো কোনো শিকল। আর আল্লাহ তাআলার প্রতি অভিযাত্রার জন্য প্রয়োজন সুউচ্চ সাহসিকতা, সুদৃঢ় মানসিকতা এবং একনিষ্ঠ মনে অঙ্গীকার পূরণের সদিচ্ছা।

আলি ইবনু আবি তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন,

এমন পুরুষ হও যার পা মাটির বুকে,
কিন্তু তার সাহসের চূড়া নক্ষত্রের উদ্যানে।

সাহসিকতার জন্য আপনার রুহ হতে হবে সংকল্প ও সদিচ্ছার জ্বালানিতে ভরপুর। হৃদয়কে সজ্জিত হতে হবে ইবাদতের সজ্জায়। তবেই হকের পথে চলতে গিয়ে কোনো অপমান এবং তুচ্ছতাচ্ছিল্যের মুখোমুখি হতে হবে না। ইস্পাতকঠিন দৃঢ়তা আর সতেজ প্রাণশক্তি নিয়ে আপনি এগিয়ে যেতে পারবেন সম্মান ও সমৃদ্ধির দিকে। বলিষ্ঠ মনোবল নিয়ে করতে পারবেন আপনার স্বপ্নপূরণ।

আপনার মাঝে যদি তৈরি হয় সঠিক পথের অনুগত হৃদয় ও আত্মার সংযোগ, তবে চিরস্থায়ী জান্নাতই হবে এর যথোপযুক্ত বিনিময়। জীবন চলার পথে আসা বাধা-বিপত্তিগুলো দেখে হতাশ হয়ে পড়বেন না; এগুলোই আপনাকে পৌঁছে

দেবে জীবন ও আখিরাতের লক্ষ্যপূরণের দিকে; অনিবার্যভাবে আপনাকে উপনীত করবে স্বপ্নপূরণের দুয়ারে।

কবি আবুত তায়্যিব আল-মুতানাব্বি বলেন,

বিপদ যদি না হতো সব মানুষ হয়ে যেত নেতা,
অনুগ্রহ হতো বিরল আর থেমে যেত অগ্রগামিতা।

আমাদের দেহ ক্লান্ত হয়ে যায়। অনুভব করে অলসতা। কিন্তু আত্মিক চেতনার চালিকাশক্তি হচ্ছে আশার সঞ্চারণ। তা ক্লান্তিহীনভাবে ধৈর্যের সঙ্গে উদ্দেশ্যের দিকে এগিয়ে যায়। কষ্ট আর বিরক্তির স্পর্শ ছাড়াই পূরণ করে লক্ষ্য। বারংবারের চেষ্টা হয় যে আত্মার শিরোনাম, শরীর তার সম্মুখে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে না। তাই যার ঝুলিতে থাকবে সাহসিকতার দীপ্ত শিখা, দ্রুত হোক বা বিলম্বে, তার লক্ষ্যপূরণ অবশ্যম্ভাবী।

কবি মুতানাব্বি আরও বলেন,

আত্মা যদি বৃদ্ধ হয়ে পড়ে,
দেহ ক্লান্ত হয়ে যায় লক্ষ্যপূরণে।

তিনি আরও বলেন,

যারা কাজ সম্পূর্ণ করার ক্ষমতা রাখে,
তাদের অসম্পূর্ণতার চেয়ে বড় দোষ আর কিছু নেই।

আমি আশ্চর্য হই ওই ব্যক্তিকে দেখে, যে চাইলেই পারে বাধার বিন্ধ্যাচল পাড়ি দিয়ে লক্ষ্য অর্জন করে নিতে; কিন্তু সাহসের দুর্বলতা দুনিয়া ও আখিরাতে তার জন্য ক্ষতি ডেকে আনে। এমন অনেক মানুষকে আমি দেখেছি, যাদের লক্ষ্য অর্জনের পথে ছিল অনেক বাধা ও আপত্তি; কিন্তু তাদের আকাশচুম্বী সাহসের মিনার সব বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে, সকল সংকট আর চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করে তাদের কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যে পৌঁছে দিয়েছে। উচ্চ মনোবল আর সাহসিকতার কল্যাণে বাস্তবায়িত হয়েছে তাদের মনের কোটরে লালিত রাজস্বপ্ন।

কবি বলেন,

সম্মানের লক্ষ্যের দিকে যদি হয় আপনার অভিযাত্রা
তবে আপনার মনোবল হতে হবে আকাশসম উঁচু,
তুচ্ছ হোক বা বৃহৎ, সব কাজেই সমান মৃত্যুর যন্ত্রণা,
কাপুরুষ ভাবে তার এই কাপুরুষতাই বুঝি সংযম,
নিশ্চয়ই তা অসৎ-চরিত্রের প্ররোচনা।

তাই অভীষ্ট লক্ষ্যের পথে চলতে গিয়ে দ্বিধার সঙ্গ নেওয়া বারণ। মাথা থেকে সব প্রশ্নবোধক চিহ্ন ঝেড়ে ফেলে করতে হবে পরিশ্রম। কারণ, ইতিহাস তাদেরকেই স্থান দেয়, যারা হন সুউচ্চ মনোবলের অধিকারী সাহসী। দীন ও দুনিয়ার ক্ষেত্রে তারা হয়ে যান দৃষ্টান্ততুল্য। পরবর্তী অনুসারীদের জন্য তাদের সেই সাহসিকতা হয় পথপ্রদর্শক বাতিঘর। কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনে আমার অনুসরণ করব তাদের পদচিহ্ন।

এ কথা নিশ্চিত যে, বারংবারের চেষ্টা ও সাধনাই জীবনের বাঁকে বাঁকে সফলতা লাভের একমাত্র পথ। তাই সুন্দর ভবিষ্যৎ বিনির্মাণ করতে নিজেকে গড়ে তুলুন পরিশ্রমী হিসেবে। অতীতের ভুল থেকে তৈরি করুন বর্তমান ও ভবিষ্যতের সিঁড়ি।

পাহাড়ের চূড়ায় উঠতে যে ভয় পায়,
সমস্ত জীবন তার গর্তেই কাটাতে হয়।

উচ্চ মনোবল হৃদয়-কোটরে নৈরাশ্যকে কোনো ঠাঁই দেয় না। এমন হৃদয় সর্বদা প্রভুর স্মরণে নিরত থাকে। ঠোঁটে লেগে থাকে দুআ আর জিকিরের গুনগুন। যার হৃদয়ে চাষাবাদ হয় প্রবল আশাবাদের—আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ, কল্যাণ, দান, ক্ষমা, প্রশস্ততা ও রহমতের ছায়ায় সে যাপন করে চমৎকার ভারসাম্যপূর্ণ জীবন। প্রবঞ্চনা ও অস্থিরতার শিকার হতে হয় না তাকে। ফাঁকিবাজি, অক্ষমতা আর অলসতা থেকে মুক্ত থাকেন তিনি। সবকিছুর মাঝেই তিনি অবলোকন করেন প্রদীপ্ত আলোর রেখা। সকল সংকটে তিনি উত্তরণের পথ খুঁজে বের করেন। ধৈর্যের রশিকে প্রবলভাবে আঁকড়ে ধরে করেন শক্তির সঞ্চার। বিপদে নিমজ্জিত হওয়ার পরিণতি থেকে রেহাই পেতে উদ্ধারকারী জাহাজচালনায় সুদক্ষ তিনি। তার হৃদয়ের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে আশাবাদের রাজত্ব। মনের মহাসড়কে শত শত সোডিয়াম লাইটের উজ্জ্বল আলো।